যুক্তিবাদী দিবসের বিশেষ রচনা

অধ্যাপক ডঃ আহমদ শরীফের শেষ সাক্ষাতকার

হুমায়ুন আজাদ

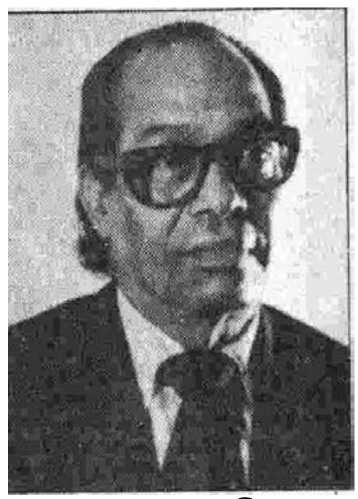

আহমদ শরীফ

ভূমিকা ও প্রশ্ন রচনায়ঃ **ডঃ হুমায়ুন আজাদ**

একটি শব্দ ধ্রুবপদের মত ফিরে ফিরে তাঁর সম্পর্কে ব্যবহার করেন পরিচিত ও অন্তরঙ্গরা। শব্দটি ছোটো, কিন্তু তার আর্থ আয়তন অভিধানের বড়ো বড়ো শব্দের থেকে অনেক ব্যাপক। শব্দটি-'অনন্য'।

তাঁরা বলেন, ডক্টর আহমদ শরীফ অনন্য। এমন আর নেই, আর পাওয়া যাবে না পলিমাটির এই ছোট্ট বদ্বীপে। দ্বিতীয় নেই, তৃতীয় নেই, চতুর্থ

নেই তাঁর। অধ্যাপক আহমদ শরীফের। অন্যরা যেখানে নিজেদের শক্ত মেরুদন্ডের স্তব ক'রে ক'রে একদিন দেখতে পেয়েছে বেশ নড়োবড়ো হয়ে গেছে ওই অস্থিখন্ড,মাথা সুচারুরূপে নত হয়ে গেছে কোন শক্তি বা সুবিধার পদতলে, তখন দেখা যায় শুধু একজনের মেরুদন্ডই উদ্ধত হয়ে আছে। সমকালীন বাঙলায় ডক্টর আহমদ শরীফ, পণ্ডিত আহমদ শরীফ হয়ে উঠেছেন প্রতিবাদের উচ্চ কণ্ঠস্বর। কোন কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্বীকার করেনি। পাকিস্তান তাঁকে স্বীকার করেনি। একাত্তরে পালিয়ে বেঁচে আছেন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে অরাজক সময়ে তাঁকে দমনের উদ্যোগ চলেছে। আর কতো পদক বানানো হয়েছে বাঙলাদেশে, কতো পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে বছরে বছরে। ভেজাল মূর্খ সুবিধাবাদী ও দালালের গলা ভ'রে গেছে সোনার পদকে। প্রায় অশিক্ষিত ব্যক্তিরা পেয়েছে শিক্ষার জন্য একুশ ও স্বাধীনতার পদক, ডক্টর আহমদ শরীফ প্রত্যাখ্যাত থেকেই পুরস্কৃত হয়েছেন। ডক্টর আহমদ শরীফ রহস্যময় ঐন্দ্রজালিক নন; আলোআঁধারির সান্ধ্য রহস্য তাঁকে ঘিরে বিরাজ করে না। তাঁর সবটাই স্পষ্ট, ভোরের আলোর মত স্বচ্ছ। তাঁর বসবাসের ঘর আলোকিত; তাঁর মুখোমুখি উপস্থিত হলে চোখের সামনে ধরা দেন একজন সুস্পষ্ট মানুষ, যাঁর বিশ্বাস, মত, বক্তব্য, জীবনযাপনের পদ্ধতি স্পষ্ট। ডক্টর আহমদ শরীফের মতো মানুষেরা শুধু সমকালের নন, তাঁরা কালকালান্তরের। তাঁরা শুধু বিশেষ একটি সময়ে জ্ঞান বিতরণ করেন না, বিতরণ করেন কাল থেকে কালে, শতাব্দীপরম্পরায়।

হু *আ ঃ ছেলেবেলার কোন ঘটনা আপনার সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে?*

আ শ ঃ বলা মুশকিল। তবে একটা ঘটনা বেশী মনে পড়ে। সেটা দু-বছর ধ'রে চলেছিলো ব'লে। আমরা যখন ক্লাশ ফাইভের ছাত্র, তখন আমাদের এক বন্ধুকে সবাই বয়কট করে। আমাদের গাঁয়েরই হিন্দুর ছেলে। ওরা ভেতরে ভেতরে সন্ত্রাসবাদীদের কাজ করতো, তা তো আমার জানা ছিলো না। আমাকে যখন বললো যে ওর সংগে কথা বলা চলবে না, তখন আমি প্রতিবাদ করেছি, *'কেনো বলবো না?'*। আমি এর পক্ষে রইলাম। এটাই আমার জীবনের প্রথম বিদ্রোহ।

হু আঃ রাজনীতিতে কি আপনি ছাত্র জীবনেই উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন?

আ শ ঃ ছাত্রাবস্থায়, যখন স্কুলে ও চট্টগ্রাম কলেজে পড়ি তখনো আমি নেতা ছিলাম। হেড মাস্টারের কাছে কিছু তদবির করা; ছুটি চাওয়া, ইনস্পেক্টর এলে ছুটির আবেদন করা ইত্যাদিতে আমার ও অন্যতম নেতৃত্ব ছিল। চট্টগ্রাম কলেজে যখন পড়ি তখন মুসলমান ছাত্রদের আমি একচ্ছত্র নেতা ছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার আগে বড়ো ভাই বললেন- *'আমাদের মতো নিম্নবিত্তের মানুষের রাজনীতি করা সাজে না। বড়োলোকেরই ওইসব সাজে। বড়োলোকের ছেলেরাই নেতা হয়। একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন যে মতিলালদের ছেলে জহরলালেরা কিছু না ক'রে ও নেতারা হন। অন্যরা হ্যান্ডবিল বিলি করে, চেয়ার টানে। কাজেই তুমি আর পলেটিকস করো না।'* এটা বলার একটা কারণ ছিলো। আমাদের বি এ পরীক্ষার আগে চট্টগ্রামে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বোমা পড়ে, আর আমরা ও বায়না ধরি যে টেষ্ট পরীক্ষা দেবো না। কলেজ কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা নেবেই। ফজলুল হক সাহেব তাঁর কয়েকজন মন্ত্রী নিয়ে এসেছিলেন নোয়াখালী। আমরা সেখানে গেলাম; তিনটি হিন্দু ছেলে ও আমি। আমি ছিলাম নেতা। অবশেষে কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদের সংগে আপোষ করে যে আমরা শুধু এক পেপার পরীক্ষা দেবো। তারপর আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলাম, তখন কোন নির্বাচনে অংশ নিলাম না; কিন্তু অভ্যাস দোষে কর্তাব্যক্তিদের মাঝে একজন ছিলাম।

হু আঃ শিক্ষকদের মধ্যে কে কেমন পড়াতেন?

আ শঃ সবচেয়ে ভালো পড়াতেন মোহিতলাল মজুমদার। তাঁর বিদ্যা ও ছিলো। আর নিষ্ঠার সংগে পড়াতেন গণেশচরণ বসু। তাঁর বিদ্যা যে আছে, বোঝা যেত; তবে তাঁর বিষয় ছিলো নীরস, আর হাসতেন না ব'লে তাঁর পড়ানোটা আমাদের তেমন ভালো লাগতো না।

হু আঃ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কেমন ছিলেন?

আ শঃ শহীদুল্লাহ সাহেবের কথা ইমপ্রেসিভ হতো না। তিনি বিদ্বান ছিলেন ব'লে, অনেক কিছু জানা ছিলো ব'লে, তিনি যাই

বলতেন আমাদের কাছে নতুন লাগতো। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে কোনো কিছু আলোচনা তিনি কখনোই করেন নি। আর সমালোচনার ব্যাপারে কখনো তিনি গভীর কথা বলেন নি। তাঁর বক্তৃতা তথ্যবহুল ছিলো।

হু আঃ মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের প্রতি আপনার আকর্ষণ জন্মে কি ক'রে?

আ শঃ মধ্যযুগের সাহিত্যের চর্চা করতেন আমার চাচা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ।আমাদের বাড়ি পুথিআকীর্ণ ছিলো। পুথি আমি তখন পড়িনি। পরে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পুথিগুলো দান করেন, আর পুথির কাজ করার জন্য আমাকে লেকচারার করার কথা ছিলো। যখন আমাকে রিসার্চ এসিস্টেন্ট করা হলো, তখন পুথির দায়িত্বই আমাকে দেয়া হয়। ওই দায়িত্ব পালনের জন্যে আমি প্রথমে সম্পাদনা করি লায়লী-মজনু।

হু আঃ আপনি কি মধ্যযুগের সাহিত্য ও লোক সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল?

আ শঃ আমি কখনো তারিফ করিনি। আমি তাঁদের অক্ষমতার কথা বলেছি। ওই সাহিত্য অক্ষমতার সাহিত্য। লোক সাহিত্য অক্ষমের সাহিত্য অশিক্ষিতের সাহিত্য প্রাকৃত জনের সাহিত্য। *'লোক'* শব্দটি ই অবজ্ঞাজনক, গান্ধির হরিজনের মতো। তাঁরা উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি, তবে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। লালন ফকির যদি শিক্ষিত হতেন, তাহলে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ কবি হতেন।

হু আঃ কিন্তু এখন লোক সাহিত্যের অতিস্তব করা হচ্ছে চারিদিকে।

আ শঃ তা তো শত্রুতা করার মতো । আমরা ভদ্রলোক হয়ে শহরে থাকবো, বাড়িগাড়ি ফোন ফ্রিজ নিয়ে ভালো থাকবো, আর সংস্কৃতিচর্চার জন্যে কতকগুলো লোক অশিক্ষিত থেকে জেলে নৃত্য করবে, সাপুড়ে নৃত্য করবে, লুঙ্গি পরবে, শাড়ি পেঁচিয়ে পরবে, এটা শত্রুতা। এটা অমানবিক।

হু আঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আপনি দীর্ঘকাল জড়িত ছিলেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে আপনার কোন আপত্তি আছে?

আ শঃ সবচেয়ে বড়ো আপত্তি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-পরিবেশ থাকা উচিত ছিলো, তা রাখা সম্ভব হতো যদি চরিত্রবান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকেরা ভিসি হতেন। যাঁরা তোয়াজ-তোশামোদ করতে পারেন সব সময় তাঁরাই ভিসি হয়ে যান। জেংকিনসের মতো লোক ও দ্বিতীয় টার্মের জন্যে দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আরেকজন সৎ লোক এসেছিলেন, তিনি ডক্টর মাহমুদ হোসেইন। তিনি তো থাকতে পারেন নি। অন্যরা সব চাকুরী করতে এসেছেন, সরকার যা বলেছে তাই করেছেন, দিনকে রাত রাতকে দিন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আগের অবস্থার প্রথম পরিবর্তন আনেন আজম খান। ইনি ছাত্রদের মধ্যে সরকারী এজেন্ট নিযুক্ত করেন, আর পরে মোমেন খাঁ তাদের গুন্ডায় পরিণ ত করে, যাদের নাম ছিলো এনএসএফ। তারপর থেকে যারাই দেশের শাসনভার পেয়েছে এমনকি দেশে যখন মার্শাল ল' চলছে তখনো ছাত্রদের দিয়ে সরকারী বাহিনী তৈরী করেছে। সেগুলো প্রধানত ভিসিদের অনুকূল্য ও অনেক শিক্ষকের যোগাযোগের ফল।

হু আঃ কারা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য হন? লেখাপড়ার সাথে যোগ নেই যাঁদের, যাঁরা দুর্বল মেরুদণ্ডের?

আ শঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের মধ্যে ভালো পরীক্ষা পাশ উপাচার্য ছিলেন অনেকে। প্রায় অধিকাংশই। কিন্তু পরবর্তীকালে লেখাপড়া চালিয়ে গেছেন তেমন লোক দেখা যায় না। রমেশচন্দ্র মজুমদার আমাদের আগের। মাহমুদ হাসান থেকে বলি, তিনি ডিগ্রী নেয়ার পর সই করা ছাড়া আর কিছু করেন নি। শুনেছি স্যার এফ রহমান ও সই করা ছাড়া কিছুই করেন নি। মাঝখানে শুধুরমেশ চন্দ্র মজুমদার লেখাপড়া করেছেন, সারাজীবন করেছেন। মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেব ও ডিগ্রী নেয়ার পর কখনো লেখাপড়া করেন নি। মাহমুদুল হাসান করেন নি, ওসমান গণি করেন নি। আবু সাঈদ চৌধুরী ওতো এ লাইনেরই না। এ ছাড়া লেখাপড়া খুব কম সংখ্যক শিক্ষকই করেন। এক ডক্টরেট ডিগ্রি দেখিয়েই অধিকাংশ সব কিছু হন।

হু আঃ বাংলাদেশে জ্ঞান চর্চার বর্ত মান অবস্থা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

আ শঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একটি ক্ষতিকর ব্যাপার ঘটে গেছে। ছাত্র অবস্থা থেকেই শুরু। স্পেশিয়ালাইজেশন দিয়ে জ্ঞান হয় না, পটভূমি দরকার। তাই পাঠ্যবিষয়ের বাইরের জ্ঞান দরকার। আমাদের এখানে এখন তার ব্যবস্থা নেই। ফলে জ্ঞানের ভিত্তি তৈরী হচ্ছে না, খাড়া হয়ে উঠছে। একটি ডক্টরেট ক'রে জ্ঞানী হয়ে যাচ্ছে, আর কোন লেখাপড়া করছে না। এমন মানুষের দ্বারা জ্ঞানের চর্চা হ'তে পারে না। জ্ঞানী মানুষ হওয়ার পথে আমাদের দেশে বাঁধা সৃষ্টি হয়েছে।

হু আঃ শিক্ষক হিসেবে আপনার জীবন কতটা আনন্দ ময় ছিলো?

আ শঃ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে আমার এমনিতে ভালো লাগে। সারাজীবনে পারতপক্ষে আমি কোন ক্লাশ কামাই করি নি। যতোক্ষণ ক্লাশে থেকেছি আনন্দে থেকেছি।সেইজন্য ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমি চিরকাল ক্লাশে গেছি। যতোক্ষণ ক্লাশে থেকেছি ততোক্ষণই আনন্দিত জীবনের স্বাদ পেয়েছি। ক্লাশের সময়টুকুকেই আমি শ্রেষ্ঠ সময় মনে করেছি।

হু আঃ আপনি কি ছাত্রদের কোন বিশেষ চেতনায় দীক্ষিত করতে চাইতেন?

আ শঃ হ্যাঁ, চাইতাম। যুক্তির আর ন্যায়ের।

হু আঃ এ দেশে বাঙলা বিদ্যার অবস্থা কেমন?

আ শঃ ভালো না। দু'চারজন ই উল্লেখ যোগ্য।

হু আঃ বাঙলা বিদ্যার চর্চা এখানে যাঁরা করছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচজন আপনার মতে কারা?

আ শঃ আনিসুজ্জামান, তুমি, গোলাম মুরশিদ আর কলেজে আবদুল মান্নান সৈয়দ। আবু হেনার সম্ভাবনা ছিলো। অন্য লাইনে আবুল কাশেম ফজলুল হক।

হু আঃ আপনাকে কখনো সামন্ত, কখনো বুর্জোয়া, কখনো শ্রেণীহীন

মনে হয় অনেকের। আপনার কী মত?

আ শঃ আমি যখন লিখতে শুরু করি তখন দেখি যে সামাজতন্ত্র, সাম্যবাদ বা কম্যুনিজমের কথা বললেই চারিদিকের মানুষ চটে ওঠে, অথচ এ যুগে বন্টনে বাঁচা ছাড়া কোন উপায় নেই। বন্টনে বাঁচতে হলে রীতিনীতি-আইন-কানুন-শাস্ত্র সম্পর্কে নতুন ধারণা করতে হবে, পুরোনো দিয়ে হবে না। সেজন্য দরকার সমাজতন্ত্র। মানুষের সর্বশেষ আবিষ্ক্রিয়া হচ্ছে সমাজতন্ত্র, সর্বশেষ বলেই বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর গরীব দেশ গুলোতে সমাজতন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ। সে জন্য আমি সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। কিন্তু সমাজতন্ত্র বললেই মানুষ ক্ষেপে যায়, তার কারণ হলো শাস্ত্র। মানুষ বিশ্বাস-সংস্কার অনুসারে চলে। তাদের ভূতে ও ভগবানে বিশ্বাসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ওই বিশ্বাসই তাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, তারা নিয়তিবাদী হয় অদৃষ্টবাদী হয়। নতুন ব্যবস্থার জন্যে তাই আঘাত করা দরকার বিশ্বাসের দুর্গে। প্রথম লেখা থেকে আজ পর্যন্ত আমি মানুষের পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার-নিয়ম-শাস্ত্র-প্রচলিত আইন-কানুন সব কিছুতেই আঘাত করেছি।

হু আঃ আপনি সংস্কারের কোন কোন দুর্গে আঘাত করেছেন?

আ শঃ বিশ্বাসের দুর্গে আঘাত করেছি, কেননা বিশ্বাস হচ্ছে যুক্তির অভাব। যেসব বিশ্বাস উন্নতির আধুনিকতার প্রগতির সুষ্ঠ সমাজ গ'ড়ে তোলার পক্ষে বাধা, সেগুলোকে আঘাত করেছি। শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ সবটাই কুসংস্কার, তার বিরুদ্ধে চিরকাল লিখেছি।

হু আঃ আপনি যে সব ব্যাপারে প্রতিবাদ করেন সেগুলোই কি এখন আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে না?

আ শঃ ঠিক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না, তবে প্রবলভাবে আসছে। যেমন ধর্ম। ধর্ম এখন আড়ম্বরের সাথে আসছে, আনছে সরকার। কম্যুনিজম কে বাধা দেয়ার জন্যে, অশিক্ষাকে জিইয়ে রাখার জন্যে। পুঁজিবাদী শক্তি গুলো অনুন্নত দেশের সরকার গুলোকে এজেন্ট হিশাবে ব্যবহার করে, ধর্মের প্রচারণা চালায়। সাধারণ মানুষ ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাকে অন্যায় মনে করে ব'লে পছন্দ না হ'লে ও মেনে চলে।

হু আঃ আমাদের শাসক ও রাজনীতিকদের প্রচারিত ইসলামের চরিত্র

কি?

আ শঃ আমেরিকাই তো ইসলাম প্রচার করাচ্ছে। রাজনীতিকদের ইসলাম হচ্ছে সমাজতন্ত্র ঠেকানো, মানুষকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অদৃষ্টবাদী ক'রে তোলে। তাই রাশিচক্র চলছে, আমেরিকার খায় পরে যারা তারা রাশিচক্রকে বিজ্ঞান ব'লে চালাচ্ছে। এগুলোর সবই হচ্ছে একই ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন রূপ।

হু আঃ বাঙলাদেশে যে এখন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে, তার কারণ ও পরিণতি কি ব'লে আপনার মনে হয়?

আ শঃ প্রতিক্রিয়াশীলতা এখন প্রবল, কারণ আর্থ-সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ বজায় রাখার জন্য টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে ধর্মের-শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে লোকজনকে ওই পথে চালিত করছে। সরকার ও রাজনীতিকরা সর্বক্ষণ ধর্মের কথা বলছেন, ইসলামের কথা বলছেন, কিন্তু তাঁদের নিজেদের জীবনে কোনো নিয়ম-নীতি-ধর্ম নেই। দেশের অশিক্ষিত মানুষেরা চুপ ক'রে আছে বলেই তাঁরা মনে করেন তাঁদের কথা সবাই মেনে নিয়েছে। তারা তো সব বিষয়েই চুপ ক'রে থাকে।

হু আঃ বাঙলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিটি কখন থেকে মাথা তুলতে শুরু করে? এখন তাদের শক্তির পরিমাণ কতোটা?

আ শঃ তারা ১৯৭২-এ ভয়ে ভয়ে ছিলো, কথা বলতে সাহস করে নি। জেনারেল জিয়া তাঁর স্বার্থে স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রশ্রয় দিতে থাকেন, এবং সে-কারণেই তারা প্রবল হয়ে ওঠে। মোটামুটি আওয়ামী লীগকে ঘায়েল করার জন্যে জেনারেল জিয়া তাদের দাঁড় করান, আর এরশাদ সেই নীতি মেনে চলেন। ফলে তারা প্রবল হয়ে গেছে।

হু আঃ কতোটা?

আ শঃ এতো প্রবল হয়েছে যে বড়ো চাকরি, সভা-সমিতি-কমিটি, বড়ো স্থান গুলো প্রায় ই তারা দখল ক'রে ফেলেছে।তাই দেখি এখন বাঙলাদেশে মুক্তিযুদ্ধবিরোধীরাই প্রবল। অনেক চিহ্নিত রাজাকার, যেমন শাহ আজিজ তো বাঙলাদেশের ভাগ্যবিধাই হয়ে গিয়েছিলেন।

হু আঃ এটা কি খুব করুণ পরিহাস নয় যে বাঙলাদেশে মুক্তিযোদ্ধারাই রাজাকারদের সাথে হাত মিলিয়েছেন ?

আ শঃ হুজুগে যদি কেউ কিছু করে, তার মনে যদি সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট কোন শ্রেয়বোধ না থাকে, তাহলে এমন হয়। মুক্তিযোদ্ধারা আবেগে যুদ্ধে গিয়েছিলেন, কিন্তু সবার চরিত্র ছিল ছিলো না। তার প্রমাণ পাওয়া গেলো আওয়ামী লীগের রাজত্বের সময়। যুদ্ধে যোগ দিয়ে ও তাঁদের যে স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেম ছিলো না, তার প্রমাণ পাওয়া গেলো। যাঁরা প্রাণ দিতে চেয়েছিলেন, ধর্ম নিরপেক্ষ হয়েছিলেন, তাঁরাই আবার 'মুসল মান' হয়ে গেলেন।

হু আঃ আপনার কি মনে হয় যে একবার মুক্তিযোদ্ধা মানে চিরকাল মুক্তি যোদ্ধা?

আ শঃ না। মুক্তিযোদ্ধা যে সে দেশের মানুষকে ভালবাসে। এই ভালবাসা দিয়ে শুরু করলে তার থেকে বিচ্যুতি ঘটতে পারে না। আবেগে হ'লে আবেগ চ'লে যাওয়ার পর আর সে মুক্তিযোদ্ধা থাকে না। সংশোধিত মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকারের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। তাদের মধ্যে তো মিল হয়ে গেছেই।

হু আঃ আমাদের দেশের ইসলামের প্রবক্তাদের চরিত্রের স্বরূপ কি?

আ শঃ আমি মনে করি ইসলামের প্রবক্তারা 'মক্কর' (ভন্ড)। কারণ তাঁদের জীবনে ইসলাম যতোটা আছে, আমাদের জীবনে ও ততোটা আছে। ইসলাম তাঁরা জীবনে আচরণ করেন না, সরকারি সুযোগ পেয়ে তাঁরা নেতা হয়ে আমাদের ইসলাম শেখান। ইসলামে সব সমস্যার সমাধান আছে, একথা বলেন কিন্তু নিজেরা বিশ্বাস করেন না। ইসলামকে শ্রেয় মনে করলে নিজেদের জীবনে তার বিকাশ সাধনের চেষ্টা না ক'রে নিজেদের সন্তান দের মাদ্রাসায় না দিয়ে বিলেত-আমেরিকায় পাঠাতেন না। কাজেই তাঁরা ধর্মের কথা বলেন জনসাধারণকে প্রতারণা করার জন্য।

হু আঃ আপনি কি 'জাতির পিতা' তত্ত্বে বিশ্বাস করেন?

আ শঃ না। কখনো মুজিবকে জাতির পিতা বলিনি।তাঁকে তো জাতির পিতা বলিয়ে দিলেন ইন্দিরা গান্ধী।

হু আঃ শেখ মুজিব সম্পর্কে আপনি কি মত পোষণ করেন?

আ শঃ তাঁর নেতৃত্বের যোগ্যতা ছিলো না। তিনি সাহসী ছেলেন, ভালো আন্দোলনকারী ছিলেন।

হু আঃ সশস্ত্র বাহিনীর দেশ শাসন আপনার কাছে কতোটা গ্রহনযোগ্য?

আ শঃ সশস্ত্র বাহিনীর দেশ শাসনের কোন অধিকার নেই। বাড়ি পাহারার জন্যে যেমন পাহারাদার থাকে, অভ্যন্তরীণ শৃঙ্গালার জন্যে যেমন পুলিশ পাহারাদার থাকে, দেশের সীমা পাহারা দেয়ার জন্যে তেমনি সাম রিক পাহারাওয়ালা থাকে। তাঁরা সরকারি চাকুরে; দেশের শাসক হয়ে বসার কোন অধিকার তাঁদের নেই। যেহেতু তাঁদের হাতে অস্ত্র আছে, তাই গায়ের জোরে দেশ দখল করেন।

হু আঃ বাঙলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থানের মূলে কি জেনারেলদের উচ্চাভিলাষ, না রাজনীতিকদের মর্মান্তিক ব্যর্থতা?

আ শঃ রাজনীতিকদের চরিত্রহীনতা, লোভজাত দুঃশাসন-কুশাসন-লুন্ঠনের ফলে দেশে যখন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, জন গণ যখন অতীষ্ঠ হয়ে ওঠে, সেই সুযোগে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে। কাজেই বাঙলাদেশের রাজনীতিক নেতৃত্ব যদি সৎ লোকের হাতে থাকতো, তাহলে সামরিক বাহিনী সাহস পেতো না।

হু আঃ কোন সৎ রাজনীতিক দলের আবির্ভাবের কোনো সম্ভাবনা আছে ব'লে আপনার মনে হয়?

আ শঃ সৎ রাজনীতিক দলের আবির্ভাব ঘটা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। মোটমুটিভাবে আইউব খানের সময় থেকে ঘুষ নিয়ে দেশবাসীর চরিত্র হনন করা হয়েছে। সারা দেশে মানুষের চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে, ফলে কেউ

কাউকে বিশ্বাস করে না।রাজনীতি এখন ব্যবসায়ী লেনদেনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। টাকা দিলে ভোট পাওয়া যায়। এজন্যে অপরিমেয় টাকার ব্যবস্থা না হ'লে কোনো সৎ রাজনীতিক দল, সৎ নেতা কখনো এখানে সুবিধা করতে পারবে না। টাকা ঢালতে না পারলে সৎ মানুষের কোনো শক্তি নেই।

হু আঃ আমাদের দুটি প্রধান দলের প্রধানদ্বয় অনেকের মতে পরিস্থিতির ফেনা মাত্র। এটাকে কি আমাদের সার্বিক রাজনীতিক দুর্গতির লক্ষণ ব'লে মনে হয় আপনার কাছে?

আ শঃ প্রথমে আওয়ামী লীগ, ওই দলের চলা উচিৎ ছিলো ইশতেহার দিয়ে। কিন্তু তা নেই ব'লে নিহত নেতার মেয়েরই অগ্রাধিকার, এটা *পীরালি।* জেনারেল জিয়ার একটা দল ছিলো, কাজেই তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে সেই দল রক্ষা করা হচ্ছে। আদর্শ থাকলে, লক্ষ্য থাকলে তা দিয়েই দল দুটি জনগণকে সংগঠিত করতে পারতো। এদের কিছুই নেই, শেখ হাসিনা নেতা; কারণ তিনি শেখ মুজিবের কন্যা। খালেদা জিয়া নেতা কেনো? তিনি প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের স্ত্রী। এটা আদর্শে চলা নয়। এটা আমাদের জাতীয় রাজনীতির করুণ অবস্থার লক্ষণ। এটা এক রকম ধোঁকা দেয়া। আদর্শহীনতার লক্ষণ ।

হু আঃ কোন দার্শনিক ধারাটিকে আপনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন?

আ শঃ নাস্তিক্যধারা। জগৎ-জীবন-স্রষ্টার রহস্য জানার আগ্রহ থেকে দর্শন শাস্ত্রের শুরু। কুলকিনারা না পেয়ে দুর্বলেরা আস্তিক্য দর্শনগুলো গ'ড়ে তোলেন, পরবর্তীকালে সেগুলো ধর্ম নির্ভর দর্শনে পরিণত হয়। অবশ্য কেউ কেউ সংশয়বাদী হয়েছেন,নাস্তিক্যবাদী হয়েছেন । ভারতবর্ষে বৈশেষিক দর্শন বা সাংখ্য দর্শন এক সময় নাস্তিক্য দর্শন ছিলো। লোকায়েতিকেরা নাস্তিক্যবাদী। এগুলো আমার খুব পছন্দ, কারণ আমি আস্তিক্যে বিশ্বাস করি না। শাস্ত্রকে আমি মনে করি ম্যান মেইড।

হু আঃ আপনি কোনো প্রথাগত ধর্মে বিশ্বাস করেন ?

আ শঃ না, বিশ্বাস করি না। স্রষ্টা থাকতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্র থাকবে তার কোনো কথা নেই। স্রষ্টা থাকলেই তাঁর উপাসনার প্রয়োজন আছে, এটা

ও আমি বিশ্বাস করি না।

হু আঃ একজন রবীন্দ্রনাথ ও একজন মার্ক্সের মধ্যে কাকে আপনি বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন?

আ শঃ একজন রবীন্দ্রনাথ বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ যতো মানুষের হৃদয় হরণ করতে পারবেন, অভিভূত করতে পারবেন, যতোদিন টিকে থাকবেন, কার্ল মার্ক্সরা ততোদিন টিকে থাকবেন না। নতুন যুগের প্রয়োজনে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হ'লে উন্নততর অবস্থায় মার্ক্সরা পিছিয়ে পড়বেন।

(আমাদের প্রথাগত সমাজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম তাঁকে - হুমায়ুন আজাদ)

হু আঃ বিবাহপূর্ব শারীরিক সম্পর্ককে আপনি কী দৃষ্টিতে দেখেন?

আ শঃ এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। সামাজিক কারণেই বিয়ে দরকার, মারামারি ঠেকিয়ে রাখার জন্যে। বিয়ে হচ্ছে সমাজ স্বীকৃত যৌনসম্ভোগের অধিকার। এখন ইউরোপের অনুকরণে আমাদের দেশে পারমিসিভ সোসাইটি শুরু হয়ে গেছে। এর জন্যে শিক্ষার দরকার।

হু আঃ আপনি একবার বলেছিলেন যে চলচ্চিত্রে চুমোর অধিকার দিলে অনেক উপকার হবে।

আ শঃ এখনো বলি। এখানে সিনেমায় অশিক্ষিত লোকের, তরুণ তরুণীর রিরংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে আদিরসের ভিয়েন দেয়া হয়- এটা গান, নদীর ধারে গাছের তলে ছোটাছুটি, নাচ, এটা কুৎসিত। কুরুচির ব্যাপার। দুজনের প্রেমই যদি দেখানো হয়, তবে আবেগ বশত চুমো খাওয়া দোষের হ'তে পারে না।

হু আঃ মদ্যপান সম্পর্কে আপনার কি মত?

আ শঃ মদ্যপান তো খারাপ জিনিশ নয়। আমাদের এখানে নিম্নবিত্তের

লোকেরা চিরকালই মদ খেয়েছে। মাওলানা কেরামত উল্লাহর প্রচারে মুসল মানদের মধ্য থেকে মদ্যপান উঠে গেছে। বড়োলোকেরা সারা পৃথিবীতে চিরকাল মদ খেয়েছে। মাঝারি লোকেরা শাস্ত্র মানে ব'লে খায় না। ইসলামে ও প্রথমদিকে মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিলো না। হযরত আলি একবার মাতাল অবস্থায় মসজিদে গিয়েছিলেন, তখন অহি নাজেল হয় যে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মসজিদে যাবে না। যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কায়েম হয় তখন মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু রাজা বাদশারা, ধনীরা চিরকাল মদ খেয়েছে, এখনো খায়।

হু আঃ একটা পশ্চিমা পপ নাচ ও একটা খাঁটি বাঙালী জেলে নৃত্যের মধ্যে কোনটা আপনার ভালো লাগে?

আ শঃ পপ নাচে আমার চোখ অভ্যস্ত নয় ব'লে ভালো লাগে না; আর জেলে নৃত্য অক্ষমতার দান, আমার কাছে কখনো আকর্ষণীয় ছিলো না। তবে পশ্চিমা নাচগান প্রবেশ করছে, কেননা তা অনিবার্য। এতে বাঙালিত্ব চ'লে গেলো বলে চিৎকার করেন যাঁরা, তাঁরা কূপমণ্ডুক। বাঙালি সংস্কৃতির কোনো চিরস্থায়ী রূপ নেই।

হু আঃ আমাদের দেশে বিজ্ঞানের ছাত্রশিক্ষকদের একটি বড়ো অংশ বিজ্ঞানবিরোধী ও প্রগতিবিমুখ। আপনার কি তা মনে হয়?

আ শঃ কথাটা ঠিক। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে তবলিগওয়ালা বেশি, ছাত্রদের মধ্যে সংকীর্ণ মনের ছাত্র বেশি। মানব বিদ্যা ও সমাজবিদ্যার ছাত্রশিক্ষকদের থেকে বিজ্ঞানের ছাত্রশিক্ষকদের জীবনদৃষ্টি সংকীর্ণ দেখেছি। শুক্রবারে বিজ্ঞানের শিক্ষকেরাই বেশি পরিমানে মসজিদে যান। এর কারণ বোধ হয় মানুষের মনের বিকাশ ঘটে তিনটি জ্ঞানে-সাহিত্য, ইতিহাস, ও দর্শনে; এখনকার দিনে সমাজ বিজ্ঞানে। এসব বিষয় তাঁদের পড়া থাকে না, তাঁরা স্ব স্ব বিষয় প'ড়ে টেকনোক্র্যাট হন, কিন্তু বহুদর্শী হন না। এ জন্যেই বোধ হয় তাঁদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলতা থেকে যায়, জীবন দৃষ্টি প্রসার লাভ করে না।

হু আঃ আপনি কি মেজাজি মানুষ না ঠান্ডা স্বভাবের?

আ শঃ মেজাজি মেজাজি মেজাজি। আমি তর্ক করতে ভালোবাসি। বুদ্ধিমান লোক হ'লে ঘন্টার পর ঘন্টা তর্ক করতে পারি। ইডিয়সি আমি

সহ্য করতে পারি না।

হু আঃ আপনি কি ঘৃণা করেন?

আ শঃ হ্যাঁ। ঘৃণা করি, নিন্দা করি।

হু আঃ আপনি কি আবেগী মানুষ?

আ শঃ হ্যাঁ। আবেগ আছে, আমি বিচলিত হই। বিপদে আপদে অসুখে দুর্ঘটনায় আমি বিচলিত হই।

হু আঃ প্রতিভার বিনয় আর প্রতিভার ঔদ্ধত্যের মধ্যে কোনটা আপনার পছন্দ?

আ শঃ প্রতিভার ঔদ্ধত্যই আমার বেশি গ্রহণীয় মনে হয়। কারণ উদ্ধত মানুষ সহজে চরিত্রহীন হ'তে পারে না। আত্মপ্রত্যয়ী আত্মমর্যাদাসম্পন্ন না হ'লে কেউ উদ্ধত হতে পারে না।কৃত্রিম বিনয়ে অনেকেই বিনীত। বিনীত মানুষেরা সুবিধাবাদী হয়।

হু আঃ আপনি কি গান শোনেন?

আ শঃ হ্যাঁ। রবীন্দ্র সঙ্গীত, কীর্তন।

হু আঃ আপনার কি মৃত্যু র কথা মনে হয়?

আ শঃ আমার মৃত্যু ভয় নেই। যন্ত্রণার ভয় নেই। আর পরলোকে যেহেতু আমি বিশ্বাস করি না, তাই আমার কোনো ভয় নেই। তবে আমার এমনিতে মৃত্যু চিন্তা আছে, অনেক দায়িত্ব পালন করা হয় নি।

হু আঃ একদিন অনুপস্থিত হয়ে যেতে হবে , এ বেদনা নেই?

আ শঃ তা নেই, কারণ এমনিতেই পৃথিবী আমর কাছে সংকুচিত হয়ে আসছে। সমবয়সী মানুষ কমছে, বন্ধু আত্নীয় কমছে। চারিদিকে এখন যাঁরা আছেন তাদের প্রতি আকর্ষণ বেশি নেই। পৃথিবীতে আকর্ষণীয় জিনিশ বেশি নেই। তাই মরে যাওয়া খুব সহজ ব'লে মনে করি। তবে

আমি এই জীবন কে সত্য ব'লে মানি। আমার তো ঐহিকতা আগেও কিছু ছিলো না পরেও নেই। কাজেই জীবনের তুলনা হয় না, এর রূপের রসের তুলনা নেই। জীবন এক ঐশ্বর্য। হারাতে চায় কে? কিন্তু জীবনের পরিণাম তো জানি।

হু আঃ আপনার কি মনে হয় আমাদের সব সরকার সব কর্তৃপক্ষ আপনাকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার ক'রে আপনাকে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করেছে?

আ শঃ কোনো সরকার কোনো কর্তৃপক্ষ ই আমাকে স্বীকার করে নি। আমি সরকারের প্রতিবাদ করেছি, আমার প্রতিবাদ হচ্ছে বিবেকী আত্নার প্রতিবাদ।

(সংক্ষেপিত)
দৈনিক ভোরের কাগজে প্রকাশিত (১৯৯৯)

সংগ্রহেঃ জাহেদ আহমদ

Typed using free bornosoft 2000 by Jahed Ahmed